শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই (وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই - ১

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, (وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ) তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই।

ব্যাখ্যা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্যে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ আর কিছুই নেই। তার সত্তা, সিফাত এবং কর্মসমূহের কোনো তুলনা নেই। ‘‘আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাদৃশ্য করা থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যক’’, এ কথাটি বিভিন্ন ফির্কার মানুষের কথার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কথায় পরিণত হয়েছে। এ কথার উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে কথাটি গ্রহণযোগ্য। আর যদি আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলীকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর সদৃশ অস্বীকার করেছে এবং মানুষের বিবেক ও বোধশক্তির দলীল দ্বারাও সে অস্বীকার সমর্থিত।

এ কথার ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনো মাখলুককে বিশেষিত করা যাবে না এবং আল্লাহর সিফাতের সাথে মাখলুকের কোনো সিফাতের তুলনা চলে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা শুরার ১১ নং আয়াতে বলেন,

> لَيۡسَ كَمِثۡلِهِ شَيۡءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الۡبَصِيرُ
>
> ‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’।

‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই’’ এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের মতোই মনে করে। আর ‘‘তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’ এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার ও বাতিল করে। সুতরাং যারা স্রষ্টার সিফাতসমূহকে মাখলুকের সিফাতের অনুরূপ মনে করে, তারা হলো নিন্দনীয় বাতিলপন্থী মুশাবেবহা সম্প্রদায়। আর যারা সৃষ্টির সিফাতকে স্রষ্টার সিফাতের অনুরূপ মনে করে, তাদের কুফুরী খ্রিস্টানদের কুফুরীর মতোই।

যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে, তাদের কথা হলো, আল্লাহর জন্য কোনো সিফাত সাব্যস্ত হবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, তার কুদরত, ইলম ও হায়াত রয়েছে। কেননা বান্দারা এ সিফাতগুলো দ্বারা বিশেষিত। তাদের কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহর জন্য উপরোক্ত সিফাতগুলো থেকে নামও সাব্যস্ত করা যাবে না এবং বলা যাবে না যে, তিনি الحي (চিরঞ্জীব), العليم (সর্বজ্ঞাত) এবং القدير (ক্ষমতাবান)। কেননা মাখলুকেরও এ নামগুলো রয়েছে। এমনি আল্লাহর কালাম, তার শ্রবণ, দৃষ্টি, ইচ্ছা এবং অনুরূপ অন্যান্য সিফাতের ব্যাপারেও একই কথা।

মুতাযেলারা আহলে সুন্নাতের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল, প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাবান এবং চিরঞ্জীব। সৃষ্টিকেও বলা হয় অস্তিত্বশীল, জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। অথচ তারা এ কথা বলে না যে, মাখলুকেরও

যেহেতু এ নামগুলো রয়েছে, তাই আল্লাহর জন্য এগুলো সাব্যস্ত করলে সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যায়। সুতরাং এ নামগুলোও আল্লাহ তা‘আলার জন্য সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু মুতাযেলারা আল্লাহর জন্য নাম সাব্যস্ত করে।[1]

আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী রয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং সুস্পষ্ট বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারা তা প্রমাণিত। কোনো বিবেকবান ও বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাতে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তাকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। সে নামগুলোর কিছু কিছু নাম দ্বারা তার সৃষ্টিরও নামকরণ করেছেন। এমনি তার সুউচ্চ সিফাতগুলোকেও বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। সে সিফাতগুলো থেকে কতিপয় সিফাত দ্বারা তার সৃষ্টিকে বিশেষিত করেছেন। তার অর্থ এ নয় যে, ঐ সিফাতগুলো দ্বারা যাদের নাম রাখা হয়েছে, তারা নামকরণকারীর মতোই। আল্লাহ তা‘আলা তার নিজেকে চিরঞ্জীব, মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাধর, করুণাবান, দয়ালু, শক্তিমান, প্রজ্ঞাবান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, বাদশাহ, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, মহামহিম ইত্যাদি নামে নামকরণ করেছেন। এ নামগুলো দিয়ে তার কতিপয় বান্দাকেও নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

> ‘‘তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন’’। (সূরা আল ‘আনআম: ৯৫, সূরা আর রূম: ১৯)

সূরা যারিয়াতের ২৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

> ‘‘তারা তাকে একজন জ্ঞানবান সন্তানের সুসংবাদ দিলেন’’।

সূরা সাফফাতের ১০১ নং আয়াতে তিনি আরো বলেন,

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

> ‘‘আমি তাকে একটি সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম’’।

সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

> ‘‘মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াবান করুনাময়’’।

সূরা দাহারের ২ নং আয়াতে তিনি বলেন,

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

> ‘‘আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানিয়েছি’’।

সূরা ইউসুফের ৫১ নং আয়াতে তিনি আরো বলেন,

قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

> ‘‘আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে’’।

সূরা কাহাফের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

> ‘‘তাদের সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহ যে প্রত্যেকটি নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিতো’’।

সূরা সেজদার ১৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

> ‘‘এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মুমিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে? এ দু’পক্ষ সমান হতে পারে না’’।

সূরা মুমিনের ৩৫ নং আয়াতে তিনি বলেন,

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

‘‘এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন’’।

এটি জানা কথা যে, এক জীবন্ত প্রাণী অন্য জীবন্ত প্রাণীর মতো নয়, একজন জ্ঞানী অন্যজন জ্ঞানীর সমতুল্য নয় এবং এক ক্ষমতাবান অন্য ক্ষমতাবানের সমকক্ষ নয়। অনুরূপ কথা অন্যান্য সকল নামের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ

> ‘‘তার জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না’’। (সূরা আল বাকারা: ২৫৫)

আল্লাহ তা‘আলা সূরা নিসার ১৬৬ নং আয়াতে বলেন,

لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ

> ‘‘কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু তোমাদের উপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন’’।

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফাতিরের ১১ নং আয়াতে বলেন,

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

> ‘‘কোনো নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবল আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে’’।

সূরা যারিয়াতের ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

> ‘‘আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী’’।

সূরা হামীম সেজদার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

‘‘তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অথচ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেই চলতো’’।

জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক বিষয়ে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু’রাকআত ছলাত আদায় করে। অতঃপর যেন এ দু‘আটি পড়ে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»

> ‘‘হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ নিশ্চয় তুমি শক্তির অধিকারী কিন্তু আমি মোটেও শক্তি রাখি না। আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানি না, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান, আমার এ কাজটা আমার জন্য ভাল হবে, আমার দ্বীনে ও দুনিয়ার জীবনে এবং পরিণামে, বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমার ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি তুমি জান যে আমার এ কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমার তড়িৎ কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখো। আর আমার জন্য ভালো কাজের ফায়ছালা করো তা যেখানে আছে। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করো। অতঃপর প্রয়োজনটির নাম উল্লেখ করবে। ইমাম বুখারী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[2]

সুনানে নাসায়ী এবং অন্যান্য কিতাবে আম্মার বিন ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ দু‘আ পাঠ করতেন,

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

> ‘‘হে আল্লাহ! সকল গায়েবী বিষয়ে তোমার জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতার ওসীলায় তোমার নিকট এ প্রার্থনা করছি যে, বেঁচে থাকা যতক্ষণ আমার জন্য কল্যাণকর হয়, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো। যখন আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তখন আমাকে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আমাকে তোমার ভয় দান করো। হে আল্লাহ! ক্রোধান্বিত এবং সন্তুষ্ট সকল অবস্থায় আমাকে সত্য বলার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সম্পদশালী এবং দরিদ্র থাকা অবস্থায় আমাকে মিতব্যয়ী হওয়ার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন নেয়ামত প্রার্থনা করছি, যা কখনো শেষ হবে না এবং চক্ষু শীতলকারী এমন সম্পদ চাচ্ছি, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাকদীরের ফায়ছালা আসার পর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই তোমার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার স্বাদ ও তোমার সাক্ষাতের নেয়ামত প্রার্থনা করছি। তবে এমন কষ্ট ও মসীবতের মধ্যে নিপতিত করে নয়, যা আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর এবং এমন ফিতনায় নিপতিত করে নয়, যা দিশেহারা করে দেয় ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সঠিক পথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করো’’।[3]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল উপরোক্ত দলীলগুলোতে তার কতিপয় সিফাতের নাম রেখেছেন ইলম, কুদরত ও শক্তি। এমনি তার কতিপয় মাখলুকের সিফাতকে উপরোক্ত নামে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
>
> ''আল্লাহ দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের উপর তিনি শক্তিশালী'' (সূরা রূম: ৫৪)।

সূরা ইউসুফের ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

''অবশ্যই সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না''।

সুতরাং এ কথাটি বোধগম্য যে, সকল মানুষের ইলম এক সমান নয়, সকল মানুষের ক্ষমতাও এক সমান নয়। সুতরাং আল্লাহর ইলম তার সৃষ্টির ইলমের মতো হয় কিভাবে? এ রকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। সকল বিবেকবান ও জ্ঞানীদের জন্যই এটি বুঝা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে বিশেষিত করেছেন; যেমন-সন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, ভালোবাসা ও ঘৃণা করা, কেউ যদি এগুলোর কোনোটিকে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে যে, এ জাতীয় সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে আল্লাহর সাথে বান্দার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার জন্য দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাকে বলা হবে, তুমি তো আল্লাহর জন্য হায়াত, ইলম, ইচ্ছা, কথা বলা, শ্রবণ করা, দেখা, ক্ষমতা, এ সাতটি বিশেষণ সাব্যস্ত করো। তুমি তো এগুলোকে মাখলুকের সিফাতের অনুরূপ মনে করো না। সুতরাং আল্লাহ ও তার রসূল আল্লাহর জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, যে সন্দেহে তুমি তা অস্বীকার করছো, সে সন্দেহ তো ঐ সাতটি সিফাতেও বিদ্যমান, যা তুমি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছো। আসল কথা হলো, তুমি যা সাব্যস্ত করছো এবং যা অস্বীকার করছো, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আর আল্লাহর সমস্ত সিফাতে অবিশ্বাসী যে মুতাযেলী বলে, বান্দার সিফাতের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি আল্লাহর জন্য কোনো সিফাতই সাব্যস্ত করি না, তাকে বলো, তুমি তো আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নামগুলো সাব্যস্ত করে থাকো। যেমন তুমি আল্লাহকে الحي (চিরঞ্জীব), العليم (মহাজ্ঞানী), القادر (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) নামে নামকরণ করে থাকো। বান্দাকেও তো এ নামগুলো দিয়ে নামকরণ করা হয়। এখন মুতাযেলী যদি তোমাকে বলে, এ নামগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত হয়, বান্দার জন্য তার অনুরূপ কিছু সাব্যস্ত হয় না, তাহলে তুমি উক্ত মুতাযেলীকে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে ঐ কথাই বলো, যা সে আল্লাহর নামগুলো সাব্যস্ত করার যুক্তিতে উপস্থাপন করেছে। আসলে যে আশঙ্কায় তুমি আল্লাহ তা'আলার সিফাতগুলো অস্বীকার করেছো, সে আশঙ্কা তার অতি সুন্দর নামগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।[4]

আর কেউ যদি বলে, আমি স্রষ্টার জন্য আসমায়ে হুসনা (সুন্দর নামসমূহ) সাব্যস্ত করি না। বরং বলি রূপকার্থে

আল্লাহর জন্য নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। মূলতঃ এগুলো তার কতিপয় সৃষ্টির নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, তাহলে জেনে রাখা উচিত যে, সীমালংঘনকারী বাতেনী সম্প্রদায় এবং দার্শনিকরা অনুরূপ কথা বলে থাকে।

তার জবাবে বলা হবে, স্রষ্টার অস্তিত্বে তোমার অবশ্যই বিশ্বাস রয়েছে। তুমি বিশ্বাস করো যে, তিনি চিরঞ্জীব, স্বনির্ভর এবং অস্তিত্বশীল। সৃষ্টিও অস্তিত্বশীল এবং স্বনির্ভর। কিন্তু মাখলুক স্রষ্টার সমতুল্য নয়। সুতরাং তোমাকে স্রষ্টার এমনসব নাম ও গুণাবলীতে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, যাতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

কোনো দার্শনিক ও নাস্তিক যদি বলে, আমি স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার নাম এবং তার সিফাত কোনো কিছুই সাব্যস্ত করি না। বরং স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করি।

তার জবাবে বলা হবে যে, বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তুই হয়তো নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করে, না হয় নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হয় না। অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তুই হয় অসৃষ্টি-চিরন্তন-অনাদি-অবিনশ্বর-সদা বিদ্যমান আর তা না হলে তা হবে এমন সৃষ্টি, যা একসময় অস্তিত্বশীল ছিল না, কিন্তু পরে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। সে সঙ্গে বিবেক-বোধশক্তি দ্বারা আরো সাব্যস্ত যে, অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তু হয় সৃষ্টি এবং স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী আর তা না হলে তা হবে অসৃষ্টি এবং স্রষ্টার প্রতি অমূখাপেক্ষী।

অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তু হয় অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, আর না হয় স্বনির্ভর বা অন্যের প্রতি অমূখাপেক্ষী। যে বস্তু নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল নয়, তার পক্ষে নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল বস্তুর সাহায্য ছাড়া অস্তিত্বে আসা অসম্ভব। প্রাক্তন-চিরন্তন-অবিনশ্বর সত্তার সাহায্য ব্যতীত কোন নশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। অভাবগ্রস্ত কখনো অভাবহীনের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু সম্পর্কিত উপরোক্ত বিশেষণ থেকে এমন এক অস্তিত্বশীলের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়, যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, অবিনশ্বর-চিরন্তন, সদা বিদ্যমান, স্রষ্টা এবং অন্যের প্রতি অমূখাপেক্ষী। সে অবিনশ্বর-চিরন্তন সত্তা ব্যতীত অন্যরা তার ব্যতিক্রম। ইন্দ্রিয়, বিবেক, বোধশক্তি ও বাস্তবতা দ্বারা এএসব বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, যা নশ্বর এবং অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আর নশ্বর বস্তু কখনো নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না, সে চিরন্তন, অবিনশ্বর এবং অন্যের স্রষ্টা হতে পারে না। সে সঙ্গে সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত টিকে থাকতেও পারে না।

সুতরাং বাস্তবতা ও বোধশক্তি দ্বারা দু'টি বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো। একটি আবশ্যক এবং অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভাব্য, একটির অস্তিত্ব অনাদি-প্রাক্তন-চিরন্তন-অবিনশ্বর এবং অন্যটির অস্তিত্ব নতুন-নশ্বর। অস্তিত্বশীল এ দু'টির একটি অমুখাপেক্ষী, অন্যটি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, একটি স্রষ্টা, অন্যটি সৃষ্টি। দু'টি বস্তুই অস্তিত্বশীল ও বিদ্যমান হওয়ার দিক থেকে একই রকম। অর্থাৎ দু'টিরই অস্তিত্ব রয়েছে। অস্তিত্বশীল থাকার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। আর এটিও জানা কথা যে, উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পরস্পর সমান নয়। উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব যদি পরস্পর সমান হয়, তাহলে যা হওয়া আবশ্যক, যা হওয়া সম্ভব এবং সম্ভব নয় উভয়টি পরস্পর সমান হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। অস্তিত্বশীল দু'টি বস্তুর হাকীকত যদি একই রকম হয়, একটি চিরন্তন-অবিনশ্বর হওয়া আবশ্যক হবে এবং অন্যটির চিরন্তনতা আবশ্যক হবে না, একটি হবে স্রষ্টা, অন্যটি স্রষ্টা হবে না এবং একটি হবে অমুখাপেক্ষী এবং অপরটি হবে মুখাপেক্ষী।

আর যদি উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব পরস্পর সমান হয়, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকটিই চিরন্তন-অবিনশ্বর হওয়া আবশ্যক হবে এবং একই সাথে চিরন্তন-অবিনশ্বর হবে না। নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হবে অথবা নিজে

নিজেই অস্তিত্বশীল হবে না, স্রষ্টা হবে কিংবা স্রষ্টা হবে না, অভাবহীন-অমুখাপেক্ষী হবে বা অভাবহীন-অমুখাপেক্ষী হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয় বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব পরস্পর সমান নির্ধারণ করা হলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু একসাথে একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়। অতএব বিবেক ও বোধশক্তি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দ্বারা জানা গেল যে, উভয় বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃত ও স্বভাব পরস্পর সমান নয়। শরীয়াতের দলীল দ্বারা উক্ত ধারণা বাতিল।

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অবিনশ্বর এবং নশ্বর একদিক থেকে পরস্পর সমান। অর্থাৎ উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যদিক থেকে পরস্পর ভিন্ন। অর্থাৎ অবিনশ্বরের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব, নশ্বরের প্রকৃতি ও স্বভাব থেকে ভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করলো, সে বিবেক-বোধশক্তি ও বাস্তবতার দলীল-প্রমাণকে বাতিল করে দিল এবং একটি বাতিল কথা বলল। আর যে ব্যক্তি অবিনশ্বর ও নশ্বরের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাবকে পরস্পর সমান মনে করলো অবিনশ্বরের সিফাতকে নশ্বরের সিফাতের সাদৃশ্য করে ফেলল সেও একটি বাতিল কথা বলল। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদিও একদিক মূল্যায়নে সমান অর্থাৎ উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অস্তিত্ব, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ কুদরত এবং অন্যান্য বিশেষণে বিশেষভাবে বিশেষিত। বান্দারা এ বিশেষণগুলোর কোনটিতেই আল্লাহ তা'আলার শরীক নয়। বান্দার রয়েছে উপযুক্ত অস্তিত্ব, জ্ঞান ও ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা বান্দার বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবে বিশেষিত হওয়ার অনেক উর্ধ্বে।

আর নশ্বর ও অবিনশ্বরের অস্তিত্ব, ইলম এবং কুদরতকে যখন যৌথ মনে করা হবে, তখন এ যৌথের চিন্তা কেবল এমন ও মস্তিস্কের কল্পনার মধ্যে সীমিত থাকবে, মস্তিস্কের বাইরে ও বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। সুতরাং অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রত্যেকেরই এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব রয়েছে, যাতে অন্যের কোন অংশীদারিত্ব থাকে না।

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টির অস্তিত্বের ব্যাপারে কালামশাস্ত্রবিদ অনেকেই এলোমেলো কথা বলেছে। তারা ধারণা করেছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে অভিন্ন নাম ব্যবহার করলে কিংবা নামের দিকে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেই স্রষ্টার অস্তিত্ব বান্দার অস্তিত্বের মত হয়ে যায়।

আরেকদল লোক মনে করেছে, ''موجود (অস্তিত্বশীল)'' এ কথাটি এমন একটিلفظ مشترك ''যৌথ শব্দ'' যা বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারা তাদের জ্ঞানের অহমিকা প্রদর্শন করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা বিবেক-বুদ্ধির প্ররোচনার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাদের কথা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ موجود শব্দটি যৌথ অর্থাৎ বান্দা এবং আল্লাহর জন্য যৌথভাবে ব্যবহৃত হলেও আল্লাহর জন্য এক অর্থে এবং বান্দার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং উভয়ের জন্য মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার জন্য যখন موجود (অস্তিত্বশীল), الحي (চিরঞ্জীব), العليم (জ্ঞানবান) এবং القادر (ক্ষমতাবান) শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে তখন এগুলোর মূল অর্থ উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। তবে উক্ত সিফাতগুলো দ্বারা উভয়ের বিশেষিত হওয়ার পরিমাণ ও ধরণের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ নামগুলো ব্যাপকার্থবোধক এবং বিভক্তিযোগ্য। যেমন বলা হয়ে থাকে, অস্তিত্বশীল বস্তু বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক অস্তিত্বশীল এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল, অনাদি-চিরন্তন-চিরস্থায়ী-অবিনশ্বর অস্তিত্বশীল এবং নতুন-নশ্বর-ধ্বংসশীল অস্তিত্বশীল। موجود শব্দের সাধারণ বা মূল অর্থ সকল প্রকারের মধ্যেই বিদ্যমান।

ঐদিকে যে لفظ مشترك ‘‘যৌথ অর্থ বোধক শব্দ’’ বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিভক্তি কবুল করে না। যেমন আরবদের ভাষায় مشتري এমন একটি যৌথ অর্থ বোধক শব্দ যা বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। শব্দটি একদিকে ক্রয়-বিক্রয়ের এক পক্ষের জন্য তথা ক্রেতার জন্য ব্যবহৃত হয় আবার আসমানের তারকা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটি এমন কোন মুশতারিক বা যৌথ শব্দ নয়, যার মূল অর্থে একাধিক বিশেষ্য বিশেষিত হতে পারে। তবে এভাবে বলা যেতে পারে যে, مشتري শব্দটি এ অর্থে অথবা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে موجود শব্দটি একلفظ مشترك বা যৌথ অর্থবোধক শব্দ, যার মূল অর্থ একাধিক বস্তুর মধ্যে ভাগ হতে পারে। যেমন বলা হয়, الله موجود ‘‘আল্লাহ অস্তিত্বশীল’’ এবং العبد موجود ‘‘বান্দা অস্তিত্বশীল’’। সুতরাং দেখা যাচ্ছে موجود (অস্তিত্বশীল) শব্দটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ জাতীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

ফুটনোট

[1]. মুতাযেলারা আল্লাহর সমস্ত সিফাতকে এ যুক্তিতে অস্বীকার করে যে, তাতে আল্লাহর সাথে বান্দার তুলনা হয়ে যায়। তাদের মতে আল্লাহর জন্য যদি কুদরত, ইলম ইত্যাদি সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মাখলুকের মধ্যেও যেহেতু এ গুণগুলো রয়েছে, তাই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা হয়ে যায়। কিন্তু তারা আল্লাহর জন্য عليم (জ্ঞানী), قدير (ক্ষমতাবান) ইত্যাদি নাম সাব্যস্ত করে। এগুলো সাব্যস্ত করার সময় তাদের মাথায় এ কথা উদয় হয় না যে, সৃষ্টির মধ্যেও এ নামগুলো রয়েছে। অথচ যে অযুহাতে তারা আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করেছে, সে একই সমস্যা নাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান থাকার কারণে নামগুলোও অস্বীকার করতে হয়। অথচ তারা নামগুলো অস্বীকার করে না। সুতরাং তাদের কথার মধ্যেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহর নাম ও সিফাত একই সূত্রে গাঁথা। তাই আল্লাহর জন্য উভয়টিই সাব্যস্ত করতে হবে।

[2]. ছহীহ: ছহীহ বুখারী হা/৬৩৮২, ইবনে মাজাহ হা/১৩৮৩, আবূ দাউদ হা/১৫৩৮।

[3]. হাদীছটি ছহীহ। ইমাম হাকেমও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম যাহাবী ছহীহ বলেছেন।

[4]. মুতাযেলারা আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত নাম স্বীকার করে। তবে নামগুলোর মধ্যে যেসব বিশেষণ ও পূর্ণতার অর্থ রয়েছে, তা তারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা বলে আল্লাহ তা‘আলা ইলম ছাড়া আলীম, কুদরত ছাড়াই কাদীর, শ্রবণ করা ব্যতীতই সামী...ইত্যাদি। আশায়েরা সম্প্রদায় আল্লাহর নামগুলো এবং মাত্র সাতটি সিফাতে বিশ্বাস করে। মুতাযেলা ও আশায়েরাদের কথায় স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। এটি দেখিয়ে দেয়ার জন্যই লেখক কেবল উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা আল্লাহর সিফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তারা আল্লাহর জন্য ঐসব অতি সুন্দর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করে, যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসূল যেসব সিফাত তার প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তারা তাও সাব্যস্ত করেন। কোন সিফাতেরই তারা অপব্যাখ্যা বা অস্বীকার করে না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8872

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন